সমকাল

তারিখ ... 15 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...7... কলাম ...

লেখক বঙ্গবন্ধু

শামসুজ্জামান খান

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি বহুল পঠিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এ বইয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস এবং সে ইতিহাস প্রতিষ্ঠায় তাদের জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ ভূমিকার কথা বঙ্গবন্ধুর স্বকীয় ভাষা-ভঙ্গি ও ব্যাখ্যায় বিবৃত হয়েছে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলার মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে লেখালেখি করেননি। যারা সামান্য কিছুটা লিখেছেন, তারাও নির্যাতিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে তাদের স্বপ্ন-সাধ ও স্বাধীনতার স্পৃহার কোনো আন্তরিক ভাষ্য নির্মাণ করতে পারেননি। সে কারণেই তাদের রচনা কিছুটা গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীদের বৃত্তের বাইরে পৌঁছেনি। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এইদিক থেকে একেবারেই অনন্য। মানুষের বাঁচার লড়াই এবং সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং তার জন্য রাজনৈতিক নিপীড়ন তথা জেল-জুলুম সহ্য না করে কোনো

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

লেখক বঙ্গবন্ধু

[বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর]

রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই এ ধরনের জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু তার জীবনব্যাপী ছিলেন সেদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রমী। তার প্রথম গুণ ছিল দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং তাদের যে কোনো সংগ্রামে কাছে থাকা। জীবনব্যাপী তার রাজনীতির এই জনসংলগ্ন রূপটিই তাকে পূর্ব বাংলার মানুষের আস্থা, ভরসা এবং নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে সাহায্য করেছে। বাঙালির আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো রাজনৈতিক নেতা এতটা জনপ্রিয়তা এবং সাধারণ মানুষের ভালোবাসা পাননি। আর এ জন্যই তিনিও মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়ে জীবনবাজি রেখে পূর্ব বাংলার বাঙালির স্বাধীনতা এবং একটি নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইতিহাস-সংলগ্নতায় আকর্ষণীয়। একজন অসাধারণ রাজনৈতিক সংগঠক, এক অনলবর্ষী বক্তা এবং অঙ্গীকারদীপ্ত সাধনায় নিবেদিত এই অসাধারণ মানুষটি তার লক্ষ্যকে স্থির করে সারাজীবন কাজ করে গেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির শত-সহস্র বছরের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে বিবিসির জরিপে গণমানুষের ভোটে 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

ওপরে আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সাফল্যের যে ইতিহাস চুম্বকে সমন্বিত করেছি, তাতেই তিনি এক কিংবদন্তিপ্রতিম নেতায় পরিণত হতে পারতেন। কিন্তু একজন কৃতী লেখক হিসেবেও যে তিনি আত্মজীবনী রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন সেটিই বিস্ময়কর। এত জেল-জুলুম-নির্যাতন এবং সারাজীবন ধরে রৌদ্র-বৃষ্টিতে ভিজেপুড়ে সাধারণ মানুষের ঘাম এবং শ্রমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি রাজনীতি করেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও দেশ-বিদেশের কত লেখক-ভাবুক-চিন্তকের বই-পুঁথি পাঠ করে তিনি তার জেল জীবনের সময় কাটিয়েছেন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে যে আত্মজীবনী তিনি রচনা করেছেন সেটি তার এক অনন্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে। পাঠক, বঙ্গবন্ধু কিন্তু ওই একটি মাত্র আত্মজীবনী লিখেই তার লেখক জীবনের প্রকাশ ঘটাননি। তার অন্তত আরও তিন থেকে চারটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি এখন সম্পাদনার পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হবে বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের দৈনন্দিন বিবরণ বা ডায়েরির ওপর নির্ভর করে। এটি এখন চূড়ান্ত সম্পাদনার পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই 'কারাগারের রোজনামচা' বইটি প্রকাশিত হবে।

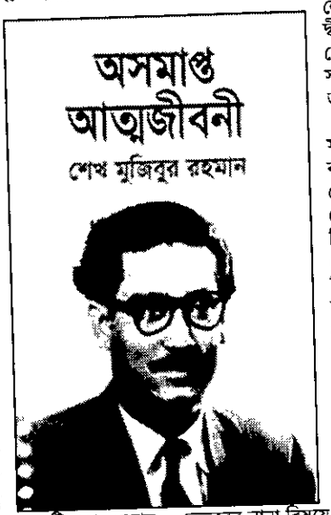

এবার তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে দু'একটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

"একটা ঘটনার দিন-তারিখ আমার মনে নেই, ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্স, শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খাঁ সাহেব। সে সভা আমাদের করতে দিল না, ১৪৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ুন কবির সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন। আমরা বললাম, এই কনফারেন্সে রাজনীতি আলোচনা হবে না। শিক্ষা ও ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা হবে (অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ সভায় আসেননি)। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)।

বঙ্গবন্ধু যে ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এদের সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে আনাই তার পরিচয় বহন করে। অতএব তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' যখন বিপুলভাবে প্রশংসাধন্য হয়, তখন এটা তো আমরা ভাবতেই পারি যে, সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ প্রথম জীবন থেকেই এবং ভেতরে ভেতরে তার মনোজগতে লেখক জীবনের প্রস্তুতিটাও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।"

"আমি হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহাবুব আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে। দরজার বাইরে আইবিরা পাহারা দিত। রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পেছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। আমি অনেক রাতে একা হাঁটাচলা করতাম। রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হলো। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগও রাজি হবে। আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে। নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেননি, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। অলি আহাদ যদিও আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সদস্য হয়নি, তবুও আমাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধা করত ও ভালোবাসত। আরও বললাম, 'খবর পেয়েছি, আমাকে শিগগিরই আবার জেলে পাঠিয়ে দেবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস।' আরও দু'একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আসতে বললাম। শওকত মিয়া ও কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকেও দেখা করতে বললাম। পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই এলো। সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭)

'সাংহাই থেকে আমরা হ্যাংচোতে এলাম। হ্যাংচো পশ্চিম হ্রদের পাড়ে। একে চীনের কাশ্মীর বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফলে ফুলে ভরা এই দেশটা। লেকের চারপাশে শহর। আমাদের নতুন হোটেলে রাখা হয়েছে, লেকের পাড়ে। ছোট ছোট নৌকায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চীন দেশের লোকরা। তারা এখানে আসে বিশ্রাম করতে। লেকের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে দ্বীপ আছে। হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারদিকে।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বইটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। বইয়ের নাম 'কারাগারের রোজনামচা'। বঙ্গবন্ধু বইয়ের কোনো নাম দিয়ে যাননি। তারিখ দিয়ে ডায়েরির মতো লিখে গেছেন। সেদিকে লক্ষ রেখেই বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় কন্যা শেখ রেহানা এই নামকরণটি প্রস্তাব করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ এই বইয়ের সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত আমাদের সকলেরই নামটি পছন্দ হয়। নামটি শ্রুতিমধুর এবং কারা-সাহিত্য হিসেবে খুবই উপযোগী। বঙ্গবন্ধু এই বইয়ের সূচনায় কোটেশনে লিখেছেন, 'থালা বাটি কম্বল/জেলখানার সম্বল'। জেলের ভেতরের নানা বিষয়ে এর আগে আর কোনো বইয়ে এমন বিস্তৃত অনুপুঙ্খ বিবরণ আমরা পাইনি। বইয়ের একটি অংশ 'বন্দুক দফা'।

"বন্দুক দফা— একটা বিখ্যাত দফা আছে যার নাম কেউই বুঝবেন না, একে বন্দুক দফা বলা হয়। একদল কয়েদি আছে যারা মেথরের কাজ করে। মেথর হলে রোজ মাছ পাওয়া যায়। তেল পাওয়া যায়। আঁটি করে বিড়ি পাওয়া যায়, সাবানও পাওয়া যায়। লোভে পড়ে অনেকে মেথর দফায় কাজ করে, পায়খানা পরিষ্কার করে। আগে জুলুম করে, মারপিট করে মেথর করতে হতো। সহজে কেউ মেথর হতে চায় না। তাই অত্যাচার করার জন্য কয়েদিদের মধ্য থেকে দালাল ঠিক করে দেওয়া হতো। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বন্দুক দফা কেন বলা হয়? একটা গল্প আছে এর পেছনে। বাঁশ দিয়ে কাঁধে নিয়ে টিনে করে পায়খানার ময়লা দূরে নিয়ে লাল গাড়িতে ফেলতে হয়। তাই টিন ঘাড়ে করে টানতে টানতে দাগ হয়ে যায়। একজন কয়েদি মেথর দফায় কাজ করতে করতে তার কাঁধে দাগ হয়ে যায়। একবার তার ভাইরা তাকে দেখতে এসে কাঁধের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করে দাগ কিসের, তার উত্তরে মেথর কয়েদিটা বলে 'আমি বন্দুক দফায় কাজ করি, সিপাহি সাহেবদের বন্দুক আমার বহন করে বেড়াতে হয়। তাই দাগ পড়ে গেছে।' সেই থেকে এই দফার নাম বন্দুক দফা।" (প্রকাশিতব্য কারাগারের রোজনামচার একটি অংশ)।

বঙ্গবন্ধুর এ রকম আরও আকর্ষণীয় বর্ণনায় আছে— পাওয়া যাবে 'পাগল দফা', 'চৌকি দফা', 'জলঘড়ি দফা', 'শয়তানের কল', 'মুচি খাতা', 'কেসটাকোল', 'রাইটার দফা'।

'কারাগারের রোজনামচা' সম্পাদনায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত আছি, তারা খুবই আনন্দময় পরিবেশে কাজ করছি। তিনি এ বই সম্পাদনার মূল ভূমিকায় থেকে যথেষ্ট সময় এবং যত্ন নিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এর অগ্রগতির দেখভাল করছেন। প্রতিদিন তার সান্নিধ্যে এবং নেতৃত্বে এ কাজ করার সময় পরিবেশটি শুধু আনন্দময়ই থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে এক প্রস্থের পর আরেক প্রস্থ খাবারের পরিবেশনায় আমাদেরও রসনা তৃপ্তিরও বিরল সুযোগ ঘটে।